IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

সংহত সমাজ প্রসঙ্গে ধর্ম

Barun Mondal

Assistant Professor

Kandra Radhakanta Kundu Mahavidyalaya

বিষয় সংক্ষেপঃ

বর্তমান বিশ্বে ধর্মীয় মেরুকরণ এক ভয়ঙ্কর রূপ গ্রহন করছে। তথাকথিত ধর্ম ভাবনার উর্দ্ধে উঠে সামাজিক সংহতি প্রতিষ্ঠা বর্তমান সময়ে আমাদের কাছে এক বিরাট চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। যদিও বিভিন্ন সময়ে প্রচলিত ধর্মমত গুলির মধ্যে আপাত বিরোধ ঘুচিয়ে ধর্মের এক সার্বজনীন রূপ দানের উদ্দেশ্যে ধর্মমত গুলির মধ্যে বিভিন্ন সংশোধন, সংযোজন, পরিমার্জন করা হয়েছে তথাপি আজও ধর্মের নামে হানাহানি বন্ধ হয়নি। আসলে ধর্মের হাত ধরে সমাজে সংহতি প্রতিষ্ঠা করতে গেলে আমাদের নিজেদের মধ্যে কিছু ধারনাগত ও অভ্যাসগত পরিবর্তন আনতে হবে যেমন বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্যের ধারনা, পরধর্ম সহিষ্ণুতার অভ্যাস, ধর্মীয় সংকীর্ণতার উর্দ্ধে উঠে মানুষের প্রতি দায়বদ্ধতা হিসাবে সামাজিক দায়িত্ব পালন, ধর্মীয় কুসংস্কার বর্জন এবং ধর্মীয় গোঁড়ামি পরিত্যাগ করে মুক্ত ও উদার মনে ধর্মকে গ্রহন করা ইত্যাদি। এগুলির দ্বারা সময় সাপেক্ষে প্রকৃত মানবধর্ম গড়ে ওঠা সম্ভব এবং তার দ্বারা বৃহত্তর সমাজে সংহতি প্রতিষ্ঠা হবে।

মূল বিষয়ঃ

ভূমিকা - ধর্মের সংজ্ঞা - ধর্মের উৎপত্তি ও বিবির্তন - ধর্মীয় সংহতির পক্ষে প্রচেষ্টা - ব্যার্থতার কারণ - নূতন আঙ্গিক - সিদ্ধান্ত

ধর্ম সম্বন্ধে কোনোরূপ আলোচোনার শুরুতেই আমাদের কাজ হল ধর্মের একটি উপযুক্ত সংজ্ঞা প্রদান করা অর্থাৎ ধর্ম কি সে সম্বন্ধে একটি সুস্পষ্ট ধারনা গড়ে তোলা। বস্তুতঃ ধর্মের সর্বজনস্বীকৃত সংজ্ঞা নিরূপন একটি দূরহ ব্যাপার কেননা ধর্ম হল অত্যন্ত জটিল বিষয়, ধর্ম মানাব জীবনের প্রতিটি দিককে ছুঁয়ে আছে। আদিম নর-নারীর গুপ্ত ধর্মানুষ্ঠান বা হৈ-চৈ পূর্ন উশ্ছৃঙ্খল উৎসব থেকে শুরু করে দার্শনিক স্পিনোজার ঈশ্বরের প্রতি বৌদ্ধিক অনুরাগ- এই সব কিছুর মধ্যে দিয়েই ধর্মের প্রকাশ ঘটছে। তাই ধর্মের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে তার সংজ্ঞা নিরূপনের চেষ্টার পরিবর্তে আমরা ধর্মের বুৎপত্তিগত সংজ্ঞাতেই নিজেদেরকে সীমাবদ্ধ রাখব। বুৎপত্তিগত দিক থেকে সংস্কৃত ‘ধৃ’ ধাতুর সাথে মন প্রত্যয় যোগে ধর্ম শব্দের উৎপত্তি। সংস্কৃত ‘ধৃ’ ধাতুর অর্থ হল ধারন করা। সুতরাং যা ধারন করে তাই ধর্ম। আবার ধর্মের ইংরেজি প্রতিশব্দ ‘Religion’ এরও উৎপত্তি ‘Religare’ শব্দ থেকে, যার অর্থ হল বন্ধন। সুতরাং বলা যায় যা আমাদের কে ধরে রাখে বা দৃঢ় ভাবে বেঁধে রাখে তাই হল ধর্ম।

এখন প্রশ্ন হল, এই ধারন করা বা বেঁধে রাখা বলতে কী বোঝায়? আর এই ধারন বা বন্ধন কিসের সাথে? মূলত এখানে ধারন বলতে বোঝায় সঙ্গতিসাধন। কিন্তু এই সঙ্গতি কিসের সাথে? এই প্রশ্নটিকে নিয়েই সমস্যা। অনেকের মতে এই সঙ্গতি হল আমরা যে সমাজ ব্যবস্থায় জন্মগ্রহন করেছি তার সাথে, সেই সমাজের আচার-আচরন এবং রীতি-নীতির সাথে। যেমন W.K.Wright ধর্মের সংজ্ঞায় বলেন- 'Religion is the endeavour to secure the conservation of socially recognized values through specific actions that are believed to evoke some agency different from the ordinary ego of the individul or from other merely human beings, and that imply a feeling of dependence upon this agency'.1 (ধর্ম হল সমাজ স্বীকৃত মূল্যের নিত্যতা বা অবিনশ্বরতাকে লাভ করার উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত বিশেষ ধরনের ক্রিয়া পদ্ধতি, যে ক্রিয়ার মাধ্যমে সাধারন ব্যক্তিআত্মা এবং আনান্য নিছক মনুষ্য জাতীয় জীব থেকে স্বতন্ত্র কোন স্বত্তাকে আহ্বান করা হয় এবং যে ক্রিয়া ঐ স্বত্তার উপর নির্ভরতা বোধ সূচিত করে)। কিন্তু এই ধরনের ব্যাখ্যানুযায়ী ধর্ম হয়ে পড়ে উত্তরাধিকার সুত্রে প্রাপ্ত আচরনের সমষ্টি মাত্র এবং সেক্ষেত্রে ধর্মীয় আচার ভিন্ন ধর্মের কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকে না। এই ধরনের আচার সর্বস্ব ধর্মের ব্যাখ্যা নিশ্চয়ই আমাদের কাঙ্খিত নয়। আবার অনেকে মনে করেন ধর্মের ক্ষেত্রে যে সঙ্গতির কথা বলা হয় তা হল যে বিশেষ সম্প্রদায়ে একজন ব্যক্তি জন্ম গ্রহন করেছে তার সাথে। অনুরূপ বক্তব্য আমরা পাই J.B.Pratt এর ধর্মের সংজ্ঞায়। সেখানে তিনি বলছেন, 'Religion is the serious and attitude of individuals or communities towards the power or powers which they conceive as having ultimate control over their interest and destinies'.2 (ধর্ম হল ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের এমন কিছু শক্তি বা ক্ষমতার প্রতি গুরুত্বপূর্ন সামাজিক মনোভাব যে শক্তিগুলিকে তারা ওই বিশেষ সম্প্রদায়ের চালিকা শক্তি বলে মনে করে)। কিন্তু এই ব্যাখ্যানুযায়ীও ধর্ম অত্যন্ত সংকীর্ন হয়ে পরে এবং শেষে সম্প্রদায়টাই ধর্ম বলে গন্য হয়। আসলে ধর্মের ক্ষেত্রে এই যে ধারন বা সম্বন্ধের বা সঙ্গতির কথা বলা হয়েছে তা হবে আমাদের বাঁচা বাড়ার সাথে আমাদের সম্বন্ধ। আরও পরিষ্কার ভাবে বলা যায়, যা আমাদেরকে বাঁচা-বাড়ার ক্ষেত্রে ধরে রাখে অর্থা□ আমাদের জীবন প্রবাহ কে ধরে রাখে এবং সেই জীবন প্রবাহ বা ধারাকে উন্নততর ও বিকশিত করতে সাহায্য করে তাই হল ধর্ম। এ প্রসঙ্গে E.S.Waterhouse এর বক্তব্য হল, 'Religion is man's belief in a Being or Beings mighter then himself and inaccessible to his senses but not indifferent to his sentiments and actions with the feelings and practices which flow from such belief.'3 (ধর্ম হল মানুষের নিজের মধ্যে অনুভূত অপর্যাপ্তিগুলিকে এক উচ্চতর সত্তার সাথে মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সম্পূরনের চেষ্টা, যে সত্তাকে সে এই জগতে প্রকশমান এবং তাদের প্রতি সহানুভূতি সূচক বলে বিশ্বাস করে)। এক কথায় ধর্ম হল এমন কিছু বিশ্বাসের সমষ্টি যার ভিত্তিতে মানুষ তার সামাজিক জীবন কে পূর্নতা লাভের দিকে পরিচালিত করতে পারে বা করে।

এখন দেখা যাচ্ছে যেহেতু এই জীবন প্রবাহ বা জীবন ধারা, এক কথায় বাঁচা-বাড়ার শর্তগুলি স্থান, কাল এবং পরিস্থিতি ভেদে পরিবর্তনশীল তাই পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাসের বা ধর্মের উ□পত্তি ঘটেছে। যেমন সামাজিক সংগঠনের প্রাথমিক ও সরলতম রূপ উপজাতি বা গোষ্টী জীবনে মানুষের মূল চাহিদা ছিল নিরন্তর বেঁচে থাকার সংগ্রাম, খাদ্যাণ্বেষণ, প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও শত্রুর হাত থেকে আত্মরক্ষা ইত্যাদি এবং সেই অনুযায়ী উপজাতীয় গোষ্ঠী গুলির মধ্যে 'সর্বপ্রানবাদ', আত্মাবাদ, ফীটিশবাদ ,বহুআত্মাউপাসনাবাদ প্রভৃত্তি ধর্ম মতের পরিচয় পাওয়া যায়। পরবর্তী কালে বিভিন্ন কারনে অনেকগুলি উপজাতির সংমিশ্রনে জাতির উদ্ভবের সাথে সাথে সমাজ জীবনে বৈচিত্র ও জটিলতা বৃদ্ধির সাথে উপজাতীয় স্তরের বহুআত্মাউপাসনাবাদ বহুদেববাদে রূপান্তারীত হল, দেবতারা নৈতিক ও মানবীয় গুনসম্পন্ন হয়ে উঠলেন। দেবতাদেরকে মানবীয় গুনসম্পন্ন রূপে প্রতিষ্টা করতে গিয়ে নানা রকম কল্পনা, অতিকথন, উপমা ইত্যাদির সাহায্য নেওয়ার ফলে জাতীয় ধর্ম বিভিন্ন প্রকার ভ্রান্ত ধারনা ও কুসংষ্কারের কবলে পরে পরষ্পরের থেকে এত দূরে চলে এল যে, তাদের মধ্যে সঙ্ঘাত অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠল। ক্রমে মানুষ ধর্মান্ধ হয়ে পড়ল এবং ধর্মকে তারা বাহন না করে ধর্মকেই তারা বহন করে চলতে শুরু করল। এই পরিস্থিতির কিছুটা পরিবর্তন হল বিভিন্ন ধর্মপ্রচারক মহাপুরুষদের আবির্ভাবে। এই সব ধর্মপ্রচারক মহাপুরুষদের হাত ধরে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দেশে

ব্যাক্তি ও জাতির জীবনে এক বিরাট আধ্যাত্মিকতার জোয়ার দেখা দিল, যার ঢেউ জাতি তথা রাষ্ট্রের সীমা ছাড়িয়ে বিশ্বের দরবারে বিশ্বজনীন ধর্ম রূপে আত্মপ্রকাশ করল। কিন্তু কালক্রমে সেইসব ধর্ম প্রবর্তকদের মৃত্যুর পর ধর্মের আভ্যন্তরীন দিকটির উপর গুরুত্ব আরোপ না করে পুনরায় আচার-অনুষ্ঠান পালনের উপর গুরুত্ব দেওয়া হতে লাগলো, যান্ত্রিক ভাবে আচার পালনই ধর্ম হয়ে দাঁড়াল। ফল স্বরূপ ধর্ম তার বৃহত্তর, উদার, মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গী হারিয়ে পুনরায় জাতীয়তাবাদে এবং স্বাতন্ত্রতাবাদে ফিরে এল। এককথায় বিচ্ছিন্নতা রয়েই গেল। যার দৃষ্টান্ত আমরা বর্তমান বিশ্বে সবসময়ই প্রত্যক্ষ করছি।

কিন্তু ধর্মের আদি রূপ বিশ্লেষণ করলে, সে যেকোনো ধর্মই হোক না কেন, আমরা দেখতে পাই সকল ধর্মেরই উৎপত্তি হয়েছিল সাধারন মানুষের স্বাভাবিক চাহিদা, অতৃপ্তি এবং নিরাপত্তার অভাব থেকে। সেখানে দেবতারা ছিলেন অলৌকিক ক্ষমতা সম্পন্ন। তাদের তুষ্ট করার জন্য মানুষেরা যজ্ঞ করত, পশু বলি ও ভোগ দিত এবং বিনিময়ে নানা রকম জাগতিক লাভের জন্য প্রার্থনা করত। কোনো গুরুত্বপূর্ন কাজের আগে মন্দিরে গিয়ে দেবতাদের পূজা দিয়ে সাফল্যের আশীর্বাদ কামনা করত। ধর্মের এই প্রাথমিক স্তরে ধর্মের সাথে আত্মা-পরমাত্মা, পরলোক ইত্যাদির কোন সংস্পর্শ ছিল না। অর্থাৎ সেখানে ধর্ম আত্মার সদ্‌গতির উপায় হিসাবে ব্যবহৃত হয়নি, তা ছিল সাধারন মানুষের কল্যানের উপায় মাত্র। ধর্মের প্রাচীন স্তরের আর একটি মূল বৈশিষ্ট্য হল সেখানে কোনো অনন্তশক্তি সম্পন্ন ঈশ্বরের ধারনা ছিল না, এক একটি নির্দিষ্ট দেব-দেবী ছিলেন নির্দিষ্ট ধরনের ক্ষমতার অধিকারী। আর এই দেব-দেবীরা ছিলেন একএকটি প্রাকৃতিক শক্তির আধার। যেমন গ্রীক দেশে দেবতা অ্যাপোলো, মিশরের দেবতা ওসিরিস, বৈদিক দেবতা বরুণ, ভারতীয় দেবতা বিষ্ণু ইত্যাদি। অর্থাৎ এই স্তরে ধর্মে-ধর্মে তেমন কোনো পার্থক্য ছিল না। যদিও সে যুগে মানব জাতি পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে বিচ্ছিন্ন ভাবে গোষ্ঠী রূপে বসবাস করতে থাকায় তাদের আচার- আচরণের মধ্যে বেশ কিছু পার্থক্য ছিল। কিন্তু তা ছিল তাদের জীবন কে সেই বিশেষ প্রাকৃতিক পরিবেশের উপযোগী করে তোলার প্রচেষ্টা। যেমন প্রচলিত হিন্দু রীতি অনুযায়ী দিন, মাস ও বৎসরের হিসাব করা হয় সূর্যের ওঠা-নামার ভিত্তিতে আর সূর্যের যাত্রা শুরু হয় পূর্ব দিক থেকে সেই কারণে তথাকথিত হিন্দুরা পূর্ব দিককে পুণ্য ও শ্রদ্ধেয় মনে করে। অপর দিকে প্রচলিত ইসলাম রীতিতে মাস,বৎসর তথা তিথির হিসাব করা হয় চন্দ্রের ওঠা-নামার ভিত্তিতে আর চন্দ্রের যাত্রা শুরু হয় পশ্চিম দিক থেকে তাই ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা পশ্চিম দিককে শ্রদ্ধেয় মানে। এক্ষেত্রে উভয়ের শ্রদ্ধার বস্তু ভিন্ন হলেও শ্রদ্ধেয়ের ধারনার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। যাইহোক, আমরা মোটামুটি ভাবে বলতে পারি যে, এই আদিম ধর্ম ছিল জীবনমুখী ও জগৎমুখী। কিন্তু পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন স্বার্থান্বেষী ব্যক্তি বা দল ধর্মের বিপরীত ব্যাখ্যার দ্বারা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে ধর্ম কে টেনে নিয়ে এসে এক জগৎ জোড়া বিচ্ছিন্নতাবাদের বিভীষিকা ডেকে নিয়ে এসেছে।

উপরের আলোচোনা থেকে বলা যায়, তথাকথিত বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে বা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে এবং মানুষের সাথে মানুষের অর্থাৎ বিশ্বসমাজের মধ্যে ঐক্য সাধনের বীজ ধর্মের মধ্যেই খুঁজে পাওয়া যাবে। কিন্তু তার জন্য আমাদের প্রথম প্রয়োজন ধর্মীয় গোঁড়ামি ও কুসংস্কার মুক্ত হয়ে যথার্থ ধর্ম ভাব জাগিয়ে তোলা। এখন প্রশ্ন হল তা কিভাবে সম্ভব?

মানব সভ্যতার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই প্রথম দিকে এই ধরনের প্রচেষ্টার শুরু হয় বিভিন্ন ধর্মের সংস্কারের মাধ্যমে, যেগুলি ধর্মীয় সংহতি স্থাপনে সম্পূর্ন ব্যার্থ হয় এবং কতগুলি নতুন ধর্মসম্প্রদায়ের জন্ম দেয়। যেমন সনাতন হিন্দু ধর্মের সংস্কারের ফলে শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব ইত্যাদি সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটল। পরবর্তী কালে বিভিন্ন সময়ে ধর্মীয় সংহতি স্থাপনের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন মতবাদ গড়ে উঠেছে এবং সেগুলি প্রয়োগের চেষ্টাও হয়েছে। যেমন-

১) <u>বিজ্ঞানবাদ বা জড়বাদঃ</u> কোনো কোন চিন্তাবিদ, বিভীষিকা রূপী ধর্মের হাত থেকে মানব সমাজ কে বাঁচাতে এবং সাধারন মানুষের মধ্যে প্রকৃত ধর্মের ধারনা জাগিয়ে তুলতে ধর্মের শাস্ত্র সম্মত ব্যাখ্যা পরিত্যাগ করে বিজ্ঞান নির্ভর বা জড়বাদী দৃষ্টিভঙ্গীতে ধর্মের ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করলেন।[4] আসলে তাঁরা আমাদের ধর্ম বিশ্বাসকে পুরোপুরি ঝেড়ে ফেলে দেবার পরিবর্তে তার থেকে অন্ধ বিশ্বাস দূর করে তাকে বিজ্ঞানের রঙে নতুন ভাবে রাঙিয়ে তুলতে চাইলেন। যেমন তারা আমাদের ধর্ম ভাবনার ঈশ্বরকে অস্বীকার করার পরিবর্তে বললেন ঈশ্বর কোন মূর্ত দ্রব্য নয় তা হল মহাজাগতিক এক অনন্ত শক্তি। যে শক্তি পদার্থ বিজ্ঞানে পারমানবিক শক্তি তাই হল আমাদের ধর্ম ভাবনার ঈশ্বর। পারমানবিক শক্তি যেমন জাগতিক সমস্ত সৃষ্টি ও ধ্বংসের কারন আমাদের ঈশ্বরও সেরূপ। আবার তারা আত্মার আমরত্ব, পুনর্জন্ম এগুলিকে অস্বীকার করলেন না বরং বললেন একটি আপত্য থেকে যে অপর অপত্যের সৃষ্টি হয় তাদের মধ্যে অবশ্যই একটি নিবিড় সম্বন্ধ স্বীকার করতেই হয় যা জীব-প্রজনন বিদ্যা দ্বারাও প্রমানিত। আর এই ধরনের সম্বন্ধের মধ্যেই আত্মার অমরত্ব ও পুনর্জন্ম এর ধারনা লুকিয়ে আছে। তারা আরো বলেন কর্মফলের আসল অর্থ হল পূর্বপুরুষ যেরূপ কর্ম করবে অর্থাৎ যে পরিবেশ সৃষ্টি করবে সেই পরিবেশেই উত্তরসুরির জন্ম হবে। এখন আমার সাথে যেহেতু আমার পূর্বপুরুষদের আত্মিক সম্বন্ধ আছে সেহেতু আমার সুখ-দুঃখ ভোগের মাধ্যমে তারাই যেন তাদের কর্মফল ভোগ করছেন।

যাইহোক, ধর্মের এই ধরনের ব্যাখ্যা দিয়ে ধর্মকে এক সার্বজনীন রূপ দেবার প্রচেষ্টা সার্থক হতে পারে না এবং হয়নি। কেননা, ধর্ম নিছক একটি বস্তুগত ব্যাপার নয়, তার সাথে ব্যাক্তি মনের অনুভূতির গভীর যোগাযোগ রয়েছে। তাই বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার সাহায্যে ধর্মের স্বরূপ বিশ্লেষণ তা কিছু উন্নতশীল দেশের এবং কিছু চিন্তাশীল মানুষের দ্বারা গৃহীত হলেও সেই বস্তুবাদী ধর্মের ব্যাখ্যা সকল মানুষ কর্তৃক গৃহীত হতে পারে না। আবার এই ধরনের বস্তুবাদী ব্যাখ্যার ফলে ধর্মের প্রতি সাধারন মানুষের কোন আকর্ষণ থাকে না। যেমন আমাদের সাধারন দৃষ্টিতে নীল আকাশে পূর্ন চন্দ্রের যে অনুপম সৌন্দর্য তা বিজ্ঞানের ব্যাখ্যার কবলে পড়ে বড় বড় গহ্বর, আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ এবং কিছু পর্বতের রূপ ধারন করে কলঙ্কে মলিন হয়ে পরে। এককথায়, ধর্মের বিজ্ঞানবাদী ব্যাখ্যার সাহায্যে মানুষের মধ্যে এক ধর্মবোধ জাগিয়ে তোলার প্রচেষ্টা সকল মানুষের দ্বারা গৃহীত হয়নি। কারন বিজ্ঞানের উপর মানুষ এখনো পূর্ণ নির্ভরশীলতা অনুভব করতে পারেনি।

২) <u>পরিবর্তনবাদঃ</u> অপর এক ধরনের চিন্তাশীল ব্যাক্তিরা ধর্মে-ধর্মে বিভেদ ঘুচিয়ে ধর্মকে মানব ঐক্যের ক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্য ধর্মের কিছু কিছু পরিবর্তন করে তাকে এক বিশুদ্ধ রূপ দেবার চেষ্টা করলেন। যেমন ভারতে এই ধরনের প্রচেষতার শুরু হয় ঊনবিংশ শতাব্দীতে রাজা রামমোহন এর হাত ধরে ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। এই ধরনের চিন্তা প্রবক্তারা মূলত সমাজ সংস্কারের ভূমিকা নেন। তাঁরা মনে করেন তথাকথিত ধর্ম যেসব আচার দ্বারা আবদ্ধ সেগুলি থেকে ধর্ম কে মুক্ত করতে পারলেই ধর্মের প্রকৃত রূপ উদ্ধার করা যাবে। এই উদ্দেশ্যে তাঁরা বিভিন্ন ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পরিত্যাগ করলেন এবং সাধারন মানুষকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন যে, সেগুলি কুসংস্কার ছাড়া আর কিছু নয়। তাদের সেই প্রচেষ্টা সাময়িক ভাবে সাফল্য লাভ করলেও সেই সাফল্য স্থায়ী হয়নি। পরবর্তী যুগে সমাজ আবার সেই সমস্ত সংস্কারে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। কেননা সাধারন মানুষ যে সমস্ত সংস্কারকে আজন্ম নিজের মধ্যে পালন করে এসেছে সেগুলিকে ছেড়ে নতুন ধারনার মধ্যে নিজেকে খাপ খাওয়াতে গিয়ে অস্বস্তি বোধ করল। শুধু তাই নয় সুক্ষ্ম ভাবে বিচার করলে দেখা যায় ঐ ধরনের সমাজ সংস্কারকরা ধর্মকে যে সম্পূর্ন আচরন মুক্ত ভাবে এক বিশুদ্ধ ধারনায় পরিনত করতে পেরেছিলেন তাও নয়। আসলে তাঁরা সদর্থক আচরন গুলিকে নঞর্থক আচরনে পরিনত করেছিলেন যেমন মূর্তি পূজা না করা ইত্যাদি। অন্যভাবে বলা যায় তাঁরা ধর্মের পরিবর্তন করতে গিয়ে শুধু আচরনেরই পরিবর্তন করেছিলেন। তাই তাঁদের ধর্মের ধারনা যৌক্তিক দিক থেকে উন্নত চিন্তার পরিচায়ক হলেও তার সাহায্যে সাধারন মানুষের ব্যাবহারিক জীবনের ধর্ম সমস্যার স্থায়ী সমাধান করা যায়নি। শুধু তাই নয় এরকম ক্ষেত্রে পরিবর্তিত ধর্ম মতটি কোনো পুরাতন ধর্ম কে প্রতিস্থাপিত করতে পারল না বরং নিজেই একটি নতুন ধর্ম রূপে আত্মপ্রকাশ করল। যেমন ব্রাহ্ম ধর্ম।

৩) মানবতাবাদঃ পরবর্তি সময়ে ধর্মীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার আর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রচেষ্টা হল বিশ্বধর্ম বা মানবধর্মের প্রবর্তন। যে ধর্মে মানুষের অতিরিক্ত কোনো অতীন্দ্রিয় শক্তি সম্পন্ন ঈশ্বর স্বীকার করা হয়নি। সেখানে প্রত্যেক বিশেষ বিশেষ মানুষের মধ্যে পার্থক্য দূর করে এক সার্বিক মানব এর ধারনা গঠন করার চেষ্টা হয়েছে। যেমন এই ধরনের প্রচেষ্টা দেখা যায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখের মধ্যে। তাঁরা চেয়েছিলেন এই ধর্ম বিশ্বমানবতা বোধের উপর প্রতিষ্ঠিত হোক এবং মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ক-ই হোক তার প্রধান লক্ষ্য। কিন্তু এক্ষেত্রে মূল অসুবিধা দেখা দিল, এখানে যে বিশ্বমানবের কথা বলা হল এবং তার উপাসনার উপায় হিসাবে সত্য, ভালোবাসা ইত্যাদি যে সমস্ত গুনের কথা বলা হল সেগুলি নিছকই বিমূর্ত ধারনা হওয়ায় সেগুলির প্রতি সাধারন মানুষ যতটা আকর্ষন অনুভব করল তার তুলনায় মূর্তির সামনে বিভিন্ন উপহার সামগ্রী প্রদান করে তার কাছে করুণা ভিক্ষাতে এবং বিভিন্ন ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের প্রতিই বেশি উদ্মাদনা অনুভব করল। তাই এই ধরনের প্রচেষ্টা কিছু চিন্তাশীল মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রয়ে গেল, তা জনসমাজে বা জনমানসে ব্যাপক বিস্তার লাভ করল না। সাধারন মানুষ সেই সংকীর্ন গোষ্ঠী ভিত্তিক আচার আচরনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রয়ে গেল।

সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে ঐক্য স্থাপনের মাধ্যমে বিশ্ব সমাজে ঐক্য স্থাপনের প্রচেষ্টায় আজ পর্যন্ত যে সমস্ত ধারনা গড়ে উঠেছে সেগুলি ধারনা গত দিক থেকে চরম উ□কর্ষতার পরিচয় দিলেও এবং এক বিচ্ছিন্নতা বিহীন সমাজ ব্যবস্থার ভাব জাগিয়ে তুলতে পারলেও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে তা সম্ভব হয়নি। তাহলে কি একথাই বলতে হবে যে ধর্মের হাত ধরে বিশ্বে ঐক্য আসতে পারে না, এক মাত্র ধর্মের উচ্ছেদের মাধ্যমেই বিশ্ব ঐক্য সম্ভব। যাইহোক, ধর্ম বিহীন সমাজের ধারনা কতটা বাস্তব সে আলোচোনায় না গিয়ে আমরা এখন ধর্মের সাহায্যেই ঐক্য স্থাপনের চেষ্টা করব।

পূর্বে আলোচিত ধর্মের মাধম্যে ঐক্য প্রতিষ্টার প্রচেষ্টার প্রতিটি রূপের মধ্যেই আমরা দেখতে পাচ্ছি সেখানে মানুষের ধর্মের ধারনার উপর আঘাত হানতে গিয়ে তাদের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান গুলোর উপর আঘাত হানা হয়েছে। কিন্তু মজার বিষয় হল এই সমস্ত আচার অনুষ্ঠান গুলি একদিনের ব্যাপার নয়, সেগুলি যুগে যুগে বংশ পরম্পরায় সমাজের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে। একজন মানুষ জন্ম মুহূর্ত থেকে তার পরিবেরের দ্বারা বিশেষ কতকগুলি আচার আচরণে অভ্যস্ত হয়ে পড়ছে এবং নিয়মিত সেগুলির অনুশীলনের ফলে তার নিজস্ব বিবেক বুদ্ধি জাগরিত হওয়ার আগেই সেগুলির সাথে সে এমন ভাবে মিশে যাচ্ছে এবং সেগুলিকে এমন ভাবে বিশ্বাস করতে শিখছে যে তার সেই আজন্ম লালিত বিশ্বাস এবং আজন্ম পালিত ধর্মীয় আচরণ থেকে তাকে মুক্ত করা সহজ নয় এমনকি প্রায় অসম্ভব, যদি না সে নিজে উপলব্ধি করে যে আচরণ আসলে ধর্ম নয় তা কেবল ধর্ম কে জাগতিক রূপ দেবার একটি উপায় মাত্র। আর এই ধরনের উপলব্ধির জন্য আমাদের যে সমস্ত ধারনাগত ও অভ্যাসগত পরিবির্তনের প্রয়োজন সেগুলি নিম্নরূপ-

ক) বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্যের ধারণাঃ ধর্মীয় সংহতির ক্ষেত্রে যে ঐক্যের কথা বলা হয় সেটি একটি জটিল ধারনা, কেননা এই ঐক্য সাদৃশ্যমূলক বা একরূপতামূলক নয়। অর্থা□ বিভিন্ন ধর্মের সংকলন, সংযোজন ও বিয়োজনের মাধ্যমে তাদের মধ্যে একরূপতা প্রনয়নের চেষ্টা এক্ষেত্রে কার্যকরী নয়। আসলে ধর্মীয় সংহতির ক্ষেত্রে ঐক্য হল বৈচিত্র বা বহুরূপতার মধ্যে ঐক্য। যেমন দক্ষ রাঁধুনি দ্বারা রান্নায় ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরনের সুগন্ধীর মিশ্রনে এক বিশেষ স্বাদ ও গন্ধের উ□পত্তি হয়, যেমন গীতিবাদ্য রচনার ক্ষেত্রে দক্ষ গীতিকারের হাতে বিভিন্ন সুরের সংকলনে এক শ্রুতিমধুর বাজনার উ□পত্তি হয় তেমনই বিভিন্ন ধর্মগুলি তাদের নিজস্বতা বজায় রেখেও পারস্পরিক মিলনে এক সুসংহত সমাজ গঠন করতে পারে। আর তার জন্য আমাদের একেশ্বরবাদের প্রয়োজন নেই, যা প্রয়োজন তা হল তিন পুরুষের মিলনে একপুরুষের ধারনা গড়ে তোলা- তথা উত্তমপুরুষ, মধ্যমপুরুষ ও প্রথমপুরুষ অর্থা□ আমি-আমরা, তুমি-তোমরা এবং সে-তাহারা এর মিলন ঘটানো।

খ) পরধর্ম সহিষ্ণুতাঃ একপুরুষের ধারনা তখনই সম্ভব যখন আমরা সকল ধর্মের প্রতি সহনশীল, শ্রদ্ধাশীল ও সমভাবাপন্ন হতে পারব। অর্থাৎ আমি কেবল আমার নিজের ধর্মকেই শ্রেষ্ঠ বলে মনে করব না, অন্যান্য ধর্মেরও কিছু ভালো গুণ আছে বা থাকতে পারে বলে মনে করব। কিন্তু কখনোই নিজের ধর্মকে ছোটো করে বা অবহেলা করে নয়, কারণ তাহলে আবার আমি একদিকি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পরব এবং তার ফলে সমাজ পরিবর্তন হবে না তা হবে হয় আমার ধর্মান্তর নতুবা এক নতুন ধর্ম মতের সৃষ্টি। এক কথায় বলা যায়, আমাদের সবসময়ই মনে রাখতে হবে আমার ধর্ম যেমন আমার কাছে শ্রেষ্ঠ ধর্ম তেমনই অপরের ধর্মও তাদের নিজের নিজের কাছে শ্রেষ্ঠ ধর্ম। এই অর্থে কোনো ধর্মই 'অধর্ম' নয় আমার নিজের ধর্ম ছাড়া আমি বাকি গুলিকে 'বিধর্ম' বলতে পারি মাত্র, এবং যেহেতু কেবল আচার-অনুষ্ঠানই ধর্ম নয় সেহেতু আমি আমার ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়েও, স্বধর্মে পালিত সদাচার অনুষ্ঠান করেও অপরাপর ধর্মসম্প্রদায়ের সামাজিক এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারি এবং তাদেরকেও আমার সম্প্রদায় কতৃক পালিত সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে আহ্বান জানাতে পারি। আর এভাবেই আমাদের অন্তর থেকে ভাতৃত্ব বোধ জেগে উঠে প্রকৃত অর্থে বিশ্বমানবের ধারনার উপলব্ধি হবে।

গ) সামাজিক দায়বদ্ধতা রূপে ধর্মঃ ধর্মের প্রকাশ শুধু নৈতিক উৎকর্ষতা ও আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না বরং ধর্মের প্রকৃত প্রকাশ হবে সামাজিক দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে। বর্তমানে আমাদের সামনে প্রাকৃতিক বিপর্যয়, অনাহার, নিত্যনতুন ব্যাধি, আতঙ্কবাদ প্রভৃতি এক একটি চ্যালেঞ্জ হিসাবে উপস্থিত হচ্ছে। এই সমস্যা গুলির সমাধানে আমরা যদি ধর্মীয় ভেদাভেদ ভুলে, মানুষের প্রতি মানুষের দায়বদ্ধতা হিসাবে, সমাজকে সুস্থ রাখতে পারস্পরিক সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে পারি তাই হবে প্রকৃত মানবধর্ম।

ঘ) কুসংস্কার বর্জনঃ বর্তমানে ধর্ম, আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতির দ্বারা সম্পৃক্ত হয়ে এমন এক জটিল রূপ পরিগ্রহ করেছে যাতে, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অসৎ উদ্দেশ্যে ধর্মের ধ্বজা ব্যবহৃত হচ্ছে। আমরা যেকোনো ধর্মাবলম্বীই হই না কেন যদি আমরা নিজেদেরকে প্রকৃত ধর্মকি বলে দাবি করি তাহলে আমাদের অবশ্যই উচিৎ ধর্মের যেকোনো ধরনের অপব্যবহারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো এবং কুসংস্কার মুক্ত প্রকৃত ধর্ম বিশ্বাসের প্রচার ও প্রসার ঘটানো।

ঙ) ধর্মীয় গোঁড়ামি পরিত্যাগঃ অহিংসা, শান্তি, কল্যাণ, মানবতা এগুলি সকল ধর্মেরই মুখ্য উদ্দেশ্য কিন্তু মানুষ যখন ধর্মের প্রকৃত পথ ছেড়ে বিপথ গামী হয়ে পড়ে তখন সে প্রায়শই বিভিন্ন প্রকার অন্ধবিশ্বাসের ফাঁদে পড়ে ধর্মের ক্ষেত্রে গোঁড়া হয়ে পরে, আর এই ধরনের ব্যাক্তিরাই ধর্মীয় ব্যানারে বিভিন্ন খারাপ কাজে লিপ্ত হয়। তাই প্রতিটি ধর্মেরই উচিৎ তাদের নিজ নিজ ধর্মের মহান দিক গুলিকে সর্বসমক্ষে, সহজবোধ্য ভাবে প্রকাশ করা যাতে ধর্মান্ধ ব্যক্তিও ধর্মের প্রকৃত তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারে। যেমন কোনো বিশেষ ধর্মের ব্যানার ছাড়া ধর্মসভা পরিচালনা করা ইত্যাদি।

আমার মতে আমাদের মধ্যে এই সমস্ত ধারনাগত ও অভ্যাসগত পরিবর্তন আনতে পারলে কালক্রমে ধর্মকে আমরা মুক্ত মানসিকতায় গ্রহন করতে পারব, আর সেদিন নিজে থেকেই ধর্মের আপাত বিরোধ ঘুচে যাবে। যদিও পৃথিবীতে ভিন্ন-ভিন্ন ধর্মের অস্তিত্ব থাকবে তথাপি কোনো ধর্মই অপর ধর্মকে প্রতিহত বা প্রতিরোধ করতে চাইবে না বরং পরস্পরের পরিপূরক হিসাবে নিজেদের বিকাশ সাধন করবে এবং সেটাই হবে প্রকৃত মানব ধর্ম।

Notes & References:

1) Wright, Willim. Kelley. (1923) *A Student's Philosophy of Religion*. New York: The Macmillan Company. (p. 47)
2) Pratt, James. Bissett. (2006) *The Religious Consciousness*. New York: Cosimo Classics. P. 2)
3) Waterhouse. Eric. S. *The Philosophical Approch to Religion*. (The Fernly-Hartley Lecture, 1993). London: Epworth Press. (1960. p. 25)
4) ডঃ অময়ি কুমার মজুমদার, স্বামী অভেদোনন্দরে বজ্ঞিান দৃষ্টি, শ্রী রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, কোলকাতা, (১৩৭১)